পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আ:)

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্য্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র ১৩৮৬ বাংলা : ৩১ শে আগষ্ট, ১৯৭৯ ইং : ৭ই শাওয়াল ১৩৯৯ হি:

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৯ ইং | ৩৩শ বর্ষ – ৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সুরা-আল কাফেরুন'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'খেলাফত ও হুকুমত'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : 'মসজিদ নির্মাণের আবশ্যকতা'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
* ঈদুল ফিতরের খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১০
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা :	হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৬
* মাহ্‌দীর সেনাদল (কবিতা)	সরফরাজ আব্দুস সাত্তার	১৯
* খোদ্দামের বার্ষিক ইজতেমা		২০
* আখবারে আহ্‌মদীয়া	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২১

'আহ্‌মদী' চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করুন। — ম্যানেজার

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده و نصلي على رسوله الكريم   و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট, ১৯৭৯ইং : ৩১শে জহুর, ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরুল কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মোঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোরআন করীমের নাযেল হওয়া সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বারবার আলোচনা করিয়াছি যে, কোরআন করীম কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাযেল হয় নাই বরং উহা মৌলিক চাহিদা মিটাইবার প্রয়োজন অনুযায়ী নাযেল হইয়াছে। উহা মন্দকে প্রতিরোধ করে এবং পুণ্য কার্যের বিবরণ বর্ণনা করে। কিন্তু আমার এই ধারণা প্রকাশ করা সত্বেও আমি এই সূরা সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, যেখানে এই সূরার মধ্যে চ্যালেঞ্জের প্রশ্ন রহিয়াছে সেখানে এই চ্যালেঞ্জ তখনই দেওয়া হইয়াছিল, যখন ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণ এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করিবার ও বুঝিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই সূরা সম্বন্ধে এই কথা মানিয়া লইতে আমার কোন আপত্তি নাই যে, নভেলডেকের ধারণা অনুযায়ী, যদি ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ ইহার বিপরীত না হয় তবে এই সূরা হয়তো আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওত-জিন্দেগীর চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে কিংবা ইহার কিছু পূর্বে নাযেল হইয়া থাকিবে। কেননা, তখনই উপযুক্ত সময় ছিল যখন বিরুদ্ধবাদীগণ ইসলামের দাবী সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ইসলামের মোকাবেলায় নিজেদের ধর্মীয় মতবাদের সঠিক সূত্র স্থির করিয়া লইয়াছিল, এবং ইসলামের প্রতি ক্রমবর্ধমান গণস্বীকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কোন না কোন উপায়ে উহার সহিত আপোষ-রফা করিবার ইচ্ছা তাহাদের অন্তরে উদিত হইতে ছিল (এই সম্পর্কে আমি সামনে অগ্রসর হইয়া দেখাইব যে এই সূরার মর্মকথা শুধু এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নহে বরং এই সূরার মধ্যে বহু ব্যাপক অর্থবোধক কথা ও গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে যে ইহার একটি মর্মকথার কারণের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহা নাযেল হইয়াছিল)। যাহা হউক, নভেলডেক প্রাচ্যবাদীগণের মধ্যে একজন বিশিষ্ট

পণ্ডিত ব্যক্তি বরং প্রাচ্যবিদগণের একজন নেতা হিসাবেও গণ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং প্রাচ্যবিদগণ এই কথা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে না যে, তাহাদের মতাবলম্বীগণের সর্ব্ব সম্মত সূত্র অনুযায়ী এই সুরা নবুওতের চতুর্থ বৎসরের অথবা খুববেশী হইলে পঞ্চম বর্ষের শুরুতে নাযেল হইয়াছিল। এই কথা মানিয়া লওয়ার পর সুরা 'নজম' সম্বন্ধে তিনি যে রেওয়াত নকল করিয়াছেন, তাহা স্বতঃই বাতিল হইয়া যায়। কেননা সুরা "নজম" নবুওতের পঞ্চম বর্ষে অথবা উহার পরবর্তী সময়ে নাযেল হইয়াছিল। সুতরাং সুরা 'কাফেরুন' অবশ্যই উহার পূর্ব্ববর্তী সময়ে নাযেল হইয়াছিল। এবং যদি সুরা 'কাফেরুন' সুরা "নজমের" পরে নাযেল হইয়া থাকে যেরূপ আমারও বিশ্বাস, এবং প্রাচ্যবিদদের সর্ব্বসম্মত সূত্র অনুযায়ীও ইহা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা কিরূপে মানিয়া লইতে পারে যে, মোশরেকদের যে দাবী সমূহ সুরা 'কাফেরুনে' অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে বাতিল করা হইয়াছিল, পরবর্তী সময়ে সুরা "নজমের" মধ্যে ঘোষিত মোশরেকদিগের সেই সকল দাবীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র জবান হইতে এমন কিছু শব্দ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল যাহাতে 'শেরকের" কিছুটা সমর্থন ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। এই কথা আমরা কিরূপে মানিয়া পাইতে পারিল? মোট কথা, এই সুরার নাযেল হওয়ার সময় সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদগণ যে সমস্ত যুক্তিতর্ক অবতারণা করিয়াছেন উহা সুরা নজমের প্রখ্যাত ঘটনাকে বাতিল করিবার জন্য এক মস্ত বড় প্রমাণ যোগায়।

তরতীব (বিন্যাস):

এই সুরা নিজ ক্ষেত্র অনুযায়ী, যেরূপ আমি উপরে বর্ণনা করিয়াছি, শেষ যুগ সম্পর্কীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ, প্রথম সুরা (সুরা কাওসার) রসুল করীম (সাঃ-এর যুগের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল। সুতরাং হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর যুগের লোকদিগকে ইহাতে শামিল করা যাইতে পারে এবং তাঁহারা সংযুক্ত ছিলেনও। কিন্তু আলোচ্য সুরায় ভবিষ্যৎ যুগের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

এই সুরার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসিবে, যখন 'কুফর' পুনরায় ইসলামের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে, এবং পার্থিব অবস্থার দিক দিয়া ইসলাম প্রায় নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হইবে, তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর 'রূহ' দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে তাঁহার মাছীল বা অনুগামীর মাধ্যমে প্রকাশিত হইবেন, এবং পৃথিবীকে পুনরায় সেই চ্যালেঞ্জই দেওয়া হইবে, যাহা তিনি প্রথমে দিয়াছিলেন। এবং বলিবেন যে, তোমরা যত শক্তিই প্রয়োগ কর না কেন, আমি 'কুফরের' নিকট পরাজিত হইব না এবং কোন 'কুফরী' কথা মানিয়া লইব না। ইহাকেই মাহদী ও মসিহের যামানা বলা হইয়া থাকে। এবং এই যুগেই দাজ্জাল ও ইয়াজুজ অর্থাৎ খৃষ্টানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রকাশে ইসলামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার কথা ছিল এবং বাহ্যতঃ ইসলামের শান-শওকতকে মিটাইয়া দিয়া খৃষ্টানদের রাজত্বকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল।

এই সুরা বলিয়া দিতেছে যে, যেখানে মুসলমান জনসাধারণ পাশ্চাত্য ভাবধারার নিকট নতি স্বীকার করিয়া উহার সমক্ষে আত্মসমর্পন করিবে সেখানে হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর 'রূহ' ইসলাম বিরোধী শক্তির সম্মুখে নতি স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবে। যদিও শত্রুগণের বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলাম এই সময়ে কোনরূপ কঠোরতা ও দৈহিক বল প্রয়োগের দ্বারা কার্য্য করিবেনা তথাপি উহা 'কুফরের' উপর বিজয় লাভ করিবে, এবং মানুষের মন কুফর ও নাস্তিকতা হইতে পবিত্র হইয়া পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন করিবে। পূর্ববর্তী সুরার সহিত আলোচ্য সুরার এক ঘনিষ্ট সম্পর্কও আছে। পূর্ববর্তী সুরায় ইহা বলা হইয়াছিল যে, হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর উপর বড় বড় পুরস্কার অবতীর্ণ করা হইবে। ঐ সকল পুরস্কার এরূপ উচ্চাঙ্গের হইবে যাহার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও মিলিবে না। আল্লাহতা'লা তাঁহাকে পৃথিবীতে এক নুতন আদমরূপে খাড়া করিবেন যাঁহার মোকাবিলায় তাঁহার শত্রুদের বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং শুধু তাঁহার বংশধরগণই টিকিয়া যাইবে। সুরা 'কাফেরুনের' মধ্যে আল্লাহতায়ালা পূর্ববর্তী সুরার মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যে, হে হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অস্বীকারকরীগণ! তোমরা তাঁহার প্রতি আমার এত বড় বড় পুরস্কার দেখা সত্বেও যখন মুসলমান হইতেছ না, তখন হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁহার অনুগামীগণ সম্বন্ধে তোমরা কিভাবে ইহা চিন্তা করিতেছ যে, তাহারা তোমাদের নোংড়া ও দুর্বল আকিদা এবং ভিত্তিহীণ কথায় ভুলিয়া তাঁহাদের ধর্মকে ছাড়িয়া দিবেন? কুসংস্কার যদি নিজ আসন ছাড়িতে রাজি না হয় তাহা হইলে অভিজ্ঞতা স্বস্থান পরিত্যাগ করিবে কেন? সুতরাং তোমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা যুক্তি বিরোধী। এরূপ অবস্থায় তোমাদের নীরবে বসিয়া আল্লাহতায়ালার মীমংসার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

بسم الله الرحمن الرحيم ০ (আমি) আল্লাহতালার নামে যিনি অশেষ দয়ালু ও বার বার করুণাকারী (আরম্ভ করিতেছি)

قل يا ايها الكفرون ০ (আমি প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণকে বলিতেছি যে,) তোমরা (কাফেরদিগকে) বলিতে থাকবে, শুন! হে কাফেরগণ,

لا اعبد ما تعبدون ০ আমি তোমাদের উপাসনার পদ্ধতি অনুযায়ী উপসনা করিনা।

ولا انتم عابدون ما اعبد ০ এবং না তোমরা আমার উপাসনার পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনা কর।

ولا انا عابد ما عبدتم এবং না আমি (তাহাদের) উপসনা করি, যাহাদের উপাসনা তোমরা করিয়া আসিতেছ।

ولا انتم عابدون ما اعبد ০ এবং না তোমরা (তাঁহার) উপসনা কর, যাঁহার উপসনা আমি করিয়া আসিতেছি।

তফসীর :—

الكافرون (আল কাফেরুন) শব্দ বিশেষ কাফেরগণকে বুঝাইতে পারে অথবা সাধারণ ভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যুগের এবং তাঁহার পরবর্তী যুগের সকল কাফেরকেও বুঝাইতে পারে। উপরে বর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী এখানে উভয় প্রকার কাফেরগণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যুগের কাফেরগণ এবং পরবর্তীকালে আগমনকারী কাফেরগণেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে মক্কার কাফেরগণেরও উল্লেখ আছে, এবং শেষ যুগে খৃষ্টান ও অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণ, যাহাদের প্রবল হওয়ার কথা, তাহাদেরও এখানে উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতের মধ্যে 'আল-কাফেরুন' শব্দের অর্থ :—(১) হে মক্কার কাফেরগণ, আমি তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি এবং (২) হে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী কাফেরগণ, বিশেষ করিয়া শেষ যুগের কাফেরগণ, যাহাদের যুগে ইসলাম একান্ত দুর্বল হইয়া তাহাদের কৃপার পাত্র হইয়া পড়িবে, আমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি।

قُلْ (কুল) শব্দের দ্বারা আল্লাহতায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে এই আদেশ দিয়াছেন যে, তুমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বল। অত্র আয়াতের শব্দগুলি ব্যাপক অর্থবোধক। এখানে সম্বোধিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শুধু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যুগের কাফেরগণই নহে, বরং পরবর্তী কালের সকল যুগের কাফেরগণও অন্তর্ভুক্ত। এই কথার মধ্যে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব বুরুজি রঙ্গে বার বার প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এই সুরায় যদি আল্লাহতায়ালা বান্দাগণকে সম্বোধন করিতেন তাহা হইলে পৃথক কথা হইত কিন্তু এই সুরায় হযরত রসুল করীম (সাঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলা যে তুমি সকল যুগের লোকদিগকে বলিয়া দাও, সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করিতেছে যে, হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর 'কুওতে-কুদসিয়া' (পবিত্র করণ শক্তি) প্রত্যেক যুগে প্রকাশিত হইতে থাকিবে, কখনও ছোট আকারে, কখনও বড় আকারে। এই দিকেই আঁ-হযরত (সাঃ) এক হাদীসের মধ্যে ইঙ্গিত করিয়া জানাইয়াছেন :

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি বা যাঁহারা তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন।"
(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড)

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খেলাফত ও হুকুমত

৩৬৯। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা অনহা বলেন : "যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাত হইল, তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) 'সুন্‌হে' নামক স্থানে, যাহা মদিনার উর্ধভাগে ছিল, বাস করিতেন হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁহার (সাঃ) ওফাতে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন : 'খোদার কসম, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরলোক গমন করেন নাই। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে পরে হযরত উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন : 'খোদার কসম, আমি তখন ইহাই মনে করিতেছিলাম এবং দৃঢ়রূপ বিশ্বাস করিতেছিলাম যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে (সাঃ) আবির্ভূত করিবেন এবং তিনি পুনরাগমন পূর্বক মুনাফিকদের হাত-পা কাটিবেন। যাহা হউক, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের খবর পাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং হুযুরের (সাঃ) চেহারামুবারক হইতে কাপড় উঠাইয়া চুম্বন করিলেন। অতঃপর বলিলেন : 'আমার মাতাপিতা আপনার (সাঃ) জন্য উৎসর্গ হউন। আপনার জীবনও কল্যাণময় অর্থাৎ সফলতার সহিত কাটাইয়াছেন এবং ওফাতও কল্যাণময়। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার কুদরতের ও শক্তি মুষ্টিগত আমার প্রাণ। আপনাকে (সাঃ) আল্লাহতায়ালা কখনো দুই মৃত্যু দিবেন না। অর্থাৎ, ইহা, হইতে পারে না যে, আপনার দৈহিক মৃত্যুর পর আপনার ধর্মও মিটিয়া যায়। এই বলিয়া তিনি 'হুজরা-মুবারক' হইতে বাহিরে আসিলেন এবং মসজিদের দিকে গেলেন। তিনি হযরত উমর (রাযিঃ)-কে বলিলেন : হে 'কসমকারী, একটু হুঁশ কর। আস, আরামের সাথে বস।" যখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ঐকথা বলিলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) বসিয়া গেলেন। হযরত আবু বক্কর (রাযিঃ) আল্লাহ তায়ালার 'হামদ ও সানা',—প্রশংসা ও স্তুতির পর বলিলেন : 'যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপাসনা করিত, তাহার জানা উচিত যে, তিনি (সাঃ) ওফাত পাইয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ইবাদত করিত, এবং ইসলামকে তাঁহার ধর্ম বলিয়া জানিত, তাহার নিশ্চিত প্রত্যয় করা উচিৎ, আল্লাহতায়ালা জীবিত। তিনি কখনও মরিবেন না'। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কুরআন করীমের এই আয়াতগুলি পাঠ করিলেন : 'তুমিও ওফাত পাইবে এবং তাহারাও ওফাত পাইবে। ('সুরা যুমর, রুকু ৩, আয়াত ৩১—অনুবাদক) 'মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ-তায়ালার রাসুল ; তাঁহার পূর্বে সব রাসুল মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এজন্য যদি তিনিও (মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মারা যান বা শহীদ হন, তবে কি তোমরা এই কারণে পদমূলে ভরদিয়া পাল্টাইয়া যাইবে ? এবং যে ব্যক্তি পদ-মূলে ভরদিয়া ফিরিয়া যায় অর্থাৎ, ধর্মত্যাগ

করে, সে আল্লাহতায়ালার কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। এবং আল্লাহতায়ালা শোকর-গোজার বান্দাগণকে উত্তম পুরস্কার দিবেন।" (সুরাহ আলে ইমরান, রুকু ১৫, আয়াত ১৪৫— অনুবাদক)। হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-র এই ভাষণ শোনিয়া লোকে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারা সুনিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে, প্রকৃতই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওফাত পাইয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সাক্কিফাহ বনি সায়েদায় সাদ" বিন ইবাদার গৃহে আনসারগণ পৃথক-সমবেত হইলেন। তাঁহারা এই স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে পৃথক 'আমীর" হইবেন এবং মুহাজেরগণের মধ্যে পৃথক আমীর হইবেন। এই কথা শোনিয়া হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত উমর (রাযিঃ) এবং হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) সহ আনসারগণের নিকট পৌঁছিলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন : "বস্তুতঃ, আমি এই উপরিস্থিতে এক ভাষণ উদ্ভাবন করিয়াছিলাম এবং ভাবিতেছিলাম যে, তাহা বড়ই ভাল এবং হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এরূপ ভাষণ দিতে পারিবেন না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যখন ভাষণ দিলেন, তখন তাঁহার ভাষণ সর্বাপেক্ষা অধিক 'ফাসীহ্-বলীগ"—প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী ছিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন : আমরা মুহাজেরগণ হইতে আমীর নির্বাচিত হওয়া উচিত এবং তোমরা আনসারগণ হইতে মন্ত্রী। অর্থাৎ আনসারগণের স্থান খলিফাগণের উজীর ও পরামর্শদাতা রূপে হইবে। ইহাতে হুবাব বিন্ মুনযির বলিলেন : 'না, না। আমরা মানিব না। আমাদের পৃথক আমীর হইবেন এবং আপনাদের পৃথক।' কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন : ইহা ঠিক নয়। আমীর আমরা কুরাইশগণ হইতে নির্বাচিত হইবে এবং আপনারা উপদেষ্টারূপে রাষ্ট্র পরিচালনায় শামিল থাকিবেন। কারণ, মুহাজেরগণই কুরাইশ হইতে হওয়ার ফলে সমগ্র আরবে প্রভাবশালী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত। এজন্য আমার পরামর্শ এই যে, আপনারা হযরত উমর বা হযরত আবু উবাইদাহ-এর নিকট বয়াত গ্রহণ করুন। ইহাতে হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন : 'না, আমরা আপনার নিকট বয়াত লইব। কারণ, আপানই আমাদের প্রধান, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি।' হযরত উমর (রাযিঃ) হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-এর হাত ধরিলেন এবং তাঁহার হাতে দীক্ষা ('বয়াত") নিলেন। ইহাতে অন্য সকলেই দীক্ষিত হইলেন। জনমণ্ডলী হইতে এক ব্যক্তি বলিল : 'তোমরা সা'দ বিন ইবাদাকে কতল করিয়াছ।' হযরত ওমর (রাঃ)বলিলেন, 'আমরা তাহাকে 'কতল' কি করিব? আল্লাহতায়ালা তাহাকে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে দেন নাই"। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওফাতের সময় উপরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়া রহিয়া ছিলেন এবং

বলিতেছিলেন : "আল্লাহুমা বির্‌রাফিকিল আলা'—অর্থাৎ, 'উর্ধবাসী সাথীর নিকট চলিয়াছি'। তিনি (সাঃ এই কথাগুলি তিন বার বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত আবু বকরের (রাযিঃ) বক্তৃতায় লোকের উপকার হইয়াছিল। হযরত উমর (রাযিঃ)-এর ভয় ছিল যেন লোকের মধ্যে কপটতা (নিফাক) সৃষ্টি না হয়। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে হেদায়েতের দিকে ফিরাইয়া দিলেন এবং আবু বকর (রাযিঃ)-কে তৌফিক দিলেন যে, তিনি সমগ্র বিষয় শামলাইয়া নেন এবং লোকগণকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যখন ভাষণ দিয়াছিলেন, তখন লোকগণ মহা সম্মানিত করিয়া 'মা মুহাম্মদুন ইল্লা রাসুল' বার বার পাঠ করিতেছিলেন এবং কাঁদিতে ছিলেন। তাঁহাদের এরূপ বোধ হইতেছিল যে, তখনই যেন তাঁহারা আয়াতটি অবগত হইলেন।

[বুখারী, 'কিতাবুল মানাকেব, 'বাবু ফাযলে আবি বকর (রাযিঃ); ১ঃ৫ ১৭ পৃঃ]

৩৭০। ইবনে শাহাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমাকে আবু সালামাহ অবহিত করিলেন যে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ফরমাইয়াছেন যে, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাতের খবর শোনিয়া 'সুনহ' নামক মহল্লাস্থ তাঁহার বাসভবন হইতে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাস ভবনে পৌঁছিলেন। মসজিদের নিকট ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া কাহারো সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া তিনি (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-র 'হুজরায়' (প্রকোষ্ঠে) গমন করেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক কাপড়ে ঢাকা ছিল। তিনি চেহারা মুবারক হইতে কাপড় উঠাইয়া নত হইয়া চুম্বন দিলেন এবং কাঁদিয়া বলিলেন : 'আমার মাতা-পিতা আপনার (সাঃ) জন্য উৎসর্গ যাউন। খোদার কসম, আপনার (সাঃ) জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত হইতে পারে না। অর্থাৎ দৈহিক মৃত্যু ত হইয়াছে। কিন্তু আপনার ধর্ম-কখনো বিলুপ্ত হইতে পারে না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন : "যখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে গেলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে হযরত উমর (রাযিঃ) লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তিনি বলিলেন : 'উমর, বসুন। কিন্তু হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, না। তবু লোকে হযরত উমর (রাযিঃ)-কে ছাড়িয়া হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-র দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন। 'হামদ ও সানা"—আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও স্তুতির পর বলিলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইবাদত করিত, তাহার জানা উচিৎ তিনি ত পরলোক গমন করিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ইবাদত করিত, তাহার স্মরণ রাখা কর্তব্য, আল্লাহতায়ালা জীবিত, তিনি মরেন না। আল্লাহতায়ালা স্বয়ং কুরআন করীমে বলেন; 'মুহাম্মদ (সাঃ) ও আল্লাহর রাসুল এবং তাঁহার পূর্বে যত রসুল হইয়াছেন, তাঁহারা সকলই পরলোক গমন করিয়াছেন।" সুতরাং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরলোক গমনে আশ্চার্যের কি

আছে? এই সম্পূর্ণ আয়াতটি তিনি পাঠ করিলেন। রেওয়ায়েতকারী বলেন যে, যখন তিনি এই আয়াত তেলাওত করিতেছিলেন, তখন মনে হইতেছিল যেন লোকগণ আজই এই আয়াত জানিতে পারিল। অতঃপর, প্রত্যেকের মুখে এই আয়াত ছিল। তাহারা ইহা পাঠ করিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। বস্তুতঃ তাহারা সুনিশ্চিত প্রত্যয় করিতে লাগিল যে, সত্যই তাহাদের কর্তা—উভয় জগতের প্রধান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওফাত পাইয়াছেন। হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন: খোদার কসম, যখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন তাহা শুনিয়া তখন আমার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হইতেছিল, আমার পা আমাকে ধারণ করিতে পারিতেছিল না আমার পদ-যুগল কাঁপিতে লাগিল। আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। আমার প্রতীতি হইতে লাগিল যে, সত্যই ত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওফাত পাইয়াছেন।

['বুখারী; কিতাবুল মাগাযি; 'বাবু মার্যিন-নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওফাতিহি, ২: ৬৪০, ১: ১৬ পৃঃ]

৩৭১। হযরত ইবাদাহ বিন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের দীক্ষা (বয়াত) লওয়ার সময় প্রতীজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন যে, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতায়, সুখে-দুঃখে সার্বাবস্থায় আমরা তাহার (সাঃ) আদেশ পালন করিব, সদা অনুগত থাকিব এবং অজ্ঞানুবর্তিতা করিব, অন্যদেরকে আমাদের চেয়ে অগ্রগণ্য করা হইলেও তথাপী আমরা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব না, যাঁহারা কাজের যোগ্য এবং ক্ষমতাবান, তাহাদের আমরা মুকাবিলা করিব না, এই ছাড়া যে খুলাখুলি কুফর দেখিতে পাই এবং আমাদের নিকট আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে কোন প্রমাণ উপস্থিত হয়, এবং আমরা আল্লাহতায়ালা সম্পর্কে কোনো ভৎসনাকারীর ভৎর্সনার পরওয়া করিব না।"

[মুসলিম, 'কিতাবুল ইমরাত, বাবু ওজুবে তায়াত্তেল উমারায়েপৃঃ ১০২]

৩৭২। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহুমা বলেন: "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছি: 'যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আনুগত্য হইতে হস্তোত্তোলন করে, সে আল্লাহতায়ালার সম্মুখে (কিয়ামতের দিন) এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার নিকট না থাকিবে কোনো যুক্তি, না কোন ওজর। এবং যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মরিবে যে, সে সমসাময়িক ইমামের 'বয়াত, করে নাই—তাহার 'জাহেলিয়ত' (অজ্ঞতা) এবং গুমরাহীর মৃত্যু হইবে'।

['মুসলিম; কিতাবুল ইমরাহ, বাবুল আমরে বে-লুযুমিল জামায়াতে ইন্দা যুহুরিল ফেতান; ১-২:২০৮ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

('হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

জামাতের সর্বত্র মসজিদ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত হইয়া মসজিদে বাজামাত নামাজ আদায় করা উচিত।

"বর্ত্তমানে আমাদের জামাতের সর্বত্র মসজিদ থাকা একান্ত প্রয়োজন। মসজিদ খোদার গৃহ হইয়া থাকে। যে গ্রামে বা শহরে আমাদের জামাতের মসজিদ কায়েম হইয়াছে, বুঝিবে যে, জামাতের উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হইল। যদি এরূপ কোন গ্রাম অথবা শহর থাকে। যেখানে মুসলমানের সংখ্যা কম থাকে অথবা মোটেই না থাকে, সেখানেও ইসলামের উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত। অতঃপর খোদাতায়ালা স্বয়ং মুসলমানদিগকে আকর্ষণ করিবেন, কিন্তু মসজিদ স্থাপনে নিয়ত খাঁটি হইতে হইবে—একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে এই কাজ করা উচিত, প্রবৃত্তি সূচক বাসনা-কামনা বা অন্য কোন স্বার্থ অথবা দুস্কৃতিমূলক উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ যেন না থাকে। তাহা হইলে খোদাতায়ালা উহাতে বরকত দান করিবেন।

ইহা জরুরী নহে যে মসজিদ অলঙ্কৃত এবং পাকা ইমারত হইতে হইবে। বরং শুধু জমি আটক করা উচিত এবং সেখানে মসজিদের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত এবং বাঁশ অথবা অন্য কোনকিছুর দ্বারা একটা ছাদ বা চাল ইত্যাদি করিয়া দেওয়া উচিত যেন বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে নিরাপদ থাকে। খোদাতায়ালা বানাওট ও আড়ম্বর পছন্দ করেন না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মসজিদ মাত্র কয়েকটি খেজুড় পাতা দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং এরূপেই চলিয়া আসিতেছিল। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ)—যেহেতু তাঁহার ইমারত নির্মাণের শওক বা ঝোঁক ছিল—তাঁহার খেলাফতকালে উহাকে পাকা করিয়া নির্মাণ করান। আমার মনে উদিত হয়, হযরত সুলেমান ও ওসমান উভয়ের ছন্দ খুব মিলে। হয়ত সেই সামঞ্জস্যের কারণে তাঁহার এ সকল বিষয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল। মোট কথা, জামাতের নিজস্ব মসজিদ হওয়া উচিত, যেখানে নিজেদের জামাতের ইমাম নিযোজিত থাকেন এবং ওয়াজ ইত্যাদি করেন, এবং জামাতের লোকজনের উচিত সকলে সম্মিলিত হইয়া যেন মসজিদে বাজামাত নামজ আদায় করেন। জামাত এবং ঐক্যের মধ্যে বড়ই বরকত নিহিত আছে। বিচ্ছিন্নতায় অনৈক্য ও পারস্পরিক শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এখন সেই সময়, যখন ঐক্য এবং সংহতির উন্নতি সাধন একান্ত আবশ্যকীয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে উপেক্ষা করা উচিত, কেননা উহা অনৈক্য ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণ ঘটায়।"

(মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১১৯)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

ঈদুল ফিতরের খোৎবা

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৬৬ ইং তারিখে রাবওয়া মোকামে প্রদত্ত]

মানুষ যে প্রতিটি নেক আমল করে উহা বহুবিধ ঈদ বহণ করে। মানুষের জীবনে এই সকল ঈদের প্রতিফলন শুধু মাত্র আল্লাতাহ-তায়ালার ফজল ও এহ্সানের উপর নির্ভরশীল।

বন্ধুগণ দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে সব চেয়ে বড় ঈদ অর্থাৎ ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের দিনও যথাশীঘ্র দেখান।

সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেনঃ

আজ ঈদের দিন, এবং ঈদ সেই ঘটনাকে বলা হয় যাহা বার বার আসে— مرّة بعد أخرى তদুপরি উহা মানুষের জন্য আনন্দের কারণ হয়। এরূপ ঘটনাবলী যাহা বার বার আসে এবং মানুষের আনন্দ লাভের কারণ হয় যেগুলি জাগতিক ঘটনাবলীও হইয়া থাকে এবং রুহানী ঘটনাবলীও হইয়া থাকে। কিন্তু জাগতিক দিক দিয়া আনন্দজনক ঘটনা সমূহ মানুষের জন্য প্রকৃত আনন্দের কারণ হওয়া জরুরী নয়। যেমন, সন্তান—মানুষ ইহাকে নেমত মনে করে এবং যে গৃহে কোন বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে সেই বাচ্চার জন্মলাভের দিন সেই গৃহবাসীর জন্য ঈদের দিন হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক সময় শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গেই তাহার মা অসুস্থ হইয়া পড়ে, ফলে খুশীর পরিবর্তে সকলেই দুর্ভাবনার শিকার হইয়া পড়ে। তেমনিভাবে চাকুরীজীবি লোক আছেন যাহারা মাসিক আয়ের উপর দিনাতিপাত করেন। মাসের প্রথম তারিখে তাহাদের জন্য খুশী বহণ করিয়া আনে কেননা মাসব্যাপী খরচ-পত্র চালাইবার জন্য তাহারা সেই দিন বেতন পান। এইরূপে প্রত্যেক মাসের পহেলা তারিখ তাহাদের জন্য ঈদের দিন হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন সময় মাসের প্রথম দিনে কোন মৃত্যু ঘটিয়া যায় এবং সেই দিন তাহাদের জন্য ঈদের কারণ হয় না। কোন কোন সময় মাসের প্রথম তারিখে তাহাদের মধ্যে কাহারও ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং দৃশ্যতঃ সে দুইটি আনন্দের সৌভাগ্য লাভ করে। এক তো সে প্রথম তারিখে বেতন পায় যদ্বারা সে সেই মাসের খরচ-পত্র পূরণ করে। দ্বিতীয়তঃ সন্তান লাভ তাহার খুশীর কারণ হয়। কিন্তু আবার ঘটনা এই দাঁড়ায় যে, শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর একদিকে তাহার মা অসুস্থ হইয়া পড়ে, আর অন্যদিকে তাহাকে দেখিবার ও সেবা-সশ্রুষার উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন তাহার গৃহে ভিড় জমাইতে আরম্ভ করে। স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য সেই ব্যক্তি শোকাভিভূক্ত হয় এবং যে বেতনের টাকায় তাহাকে মাসব্যাপী সংসার—খরচ নির্বাহ করতে হয়, তাহা চিকিৎসা এবং আত্মীয় স্বজনের আতিথেতায় খরচ হইয়া যায়। এইভাবে মাসের প্রথম তারিখ তাহার জন্য খুশীর কারণ হয় না। এমনিধারায় আরও শত শত দৃষ্টান্ত কল্পনা

করা যায়। মোট কথা, পার্থিব দিক দিয়া মানুষের জীবনে যে সকল ঘটনা বার বার আসিয়া থাকে এবং সাধারণভাবে সেগুলি আনন্দের কারণ হয়, জরুরী নয় যে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষেও আনন্দের কারণ হইবে। শুধু দ্বীনি ও রুহানী বিষয় সমূহই এরূপ হইয়া থাকে, যেগুলি মানুষের জীবনে বার বার আসে এবং সর্বদাই তাহার জন্য খুশী ও আনন্দের কারণ হয়, এজন্য যে সেগুলি আল্লাহর সহিত সম্পর্ক-যুক্ত হইয়া থাকে এবং কোন ব্যক্তি, কোন পরিবার অথবা কোন জাতি, যাহাদের উপর খোদাতায়ালা বার বার ফজল ও কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহারা শোকাভিভূত বা দুর্ভাবনাগ্রস্থ থাকিতে পারে না। প্রতিবার খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ অবলোকন করিয়া তাহাদের অন্তর খোদাতায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় ভরিয়া যায় এবং তাহাদের চেহারা আনন্দে উজ্জল হয়। আল্লাহতায়ালা আমাদের জন্য এই প্রকারের ঈদের বহু উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেটি নেক আমল যে মানুষ পালন করে উহা তাহার জন্য বিধ ঈদ বহণ করিয়া থাকে। যে কোন নেকীর কাজ ধরুন। প্রথমে মানুষের মনে উহার সম্পর্কে আগ্রহ বা আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়। সেজন্য খোদার বান্দা খুশী হয় যে, খোদাতায়ালা তাহার প্রতি ফজল করিয়াছেন এবং তাহার অন্তরে এই নেক কাজের আকাঙ্খা ও আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর সেই আগ্রহ বা আকাঙ্খা উন্নতি লাভ করিয়া নিয়ত বা সংকল্পের রূপ পরিগ্রহ করে এবং মানুষ উহা কার্যে পরিণত করার এরাদা করে। সে এই এরাদাও তাহার বাহুবলে করিতে পারে না, বরং এই এরাদা বা সংকল্প গ্রহণেও খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ সক্রিয় হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় বারের মত ঈদ স্বরূপ হয়, যাহা খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ ক্রমে মানুষের জন্য খুশী বহণ করিয়া আনে, এবং তাহার হৃদয় আল্লাহতায়ালার প্রশংসায় ভরিয়া যায়। সে বলে, তাহার রব তাহার উপর কত ফজল করিয়াছেন যে তাহাকে তওফিক দিয়াছেন যেন সে ঐ নেক আকাঙ্খাকে নিয়ত ও সংকল্পের রূপ দানে সমর্থ হয়। অতঃপর আল্লাহতায়ালা তাহাকে সেই নিয়ত অনুযায়ী আমল করার তওফিক দেন এবং যখন সে ঐ নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সেই নেক আমল পালন করে, তখন তৃতীয় বার তাহার হৃদয় খুশিতে ভরিয়া যায়, আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় পূর্ণ হয় এবং সে বুঝে যে, ইহা কেবলমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজল যে তিনি তাহাকে সেই নেক নিয়তকে কার্যে পরিণত করার কওফিক দান করিয়াছেন। অতঃপর যখন সে ঐ নেক আমল সম্পাদন করে এবং আল্লাহতায়ালাও তাহার সেই নেকী কবুল করিয়া নেন, তখন চতুর্থ বার সে আনন্দ লাভ করে এবং সে বিশ্বাস করে, খোদাতায়ালা তাহার উপর কত ফজল ও অনুগ্রহ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার রহমতে ও করুনা ভরে তাহার আমলটিকে কবুলও করিয়াছেন। ইহাতে সে আনন্দিত হয়।

মোট কথা, মানুষের প্রতিটি নেক আমলের মধ্যে তাহার জন্য চারিটি ঈদ প্রচ্ছন্ন বা সন্নিবেসিত রহিয়াছে এবং সে চারিবার আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও এহসানকে স্মরণ করিয়া আনন্দ লাভ করে। এই যে দুইটি ঈদ আল্লাহতায়ালা মুসলমানগণের জন্য নির্ধারণ

করিয়াছেন, ইহাদের স্বরূপ বা অবস্থাও অদ্রূপই। যেমন, ঈদুল ফিৎর—ইহার দ্বারা আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তোমাদের অন্তরে রোজা রাখার আগ্রহ বা আকাঙ্খা সৃষ্টি হইয়াছে। অত পর তোমরা রোজা রাখিবার নিয়ত করিয়াছ। তারপব আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে তওফিক—সুযোগ ও সামর্থ দান ক রয়াছেন যেন তোমরা রমজানে পূর্ণ রোজা রাখিতে পার। অতঃপর তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের এই রোজাসমূহ কবুল করিবেন এবং এই এবাদতের ফলশ্রুতিতে আপন বান্দাকে স্বীয় জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবেন। সুতরাং চারটি আনন্দ আমরা এই উপতক্ষেও দেখিতে পাই।

অতঃপর মহা পবিত্র রমজান মাসের এবাদতের মধ্যে রাত্রিকালের নামাজ-বন্দেগীও আছে। দিনের বেলায় আমরা রোজা রাখি এবং রাত্রিতে সাধারণ রাতের চাইতে বেশী এবাদত করি। যদিও হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ওয়া সাল্লাম অন্য সময়ে যতখানি নফল নামাজ পড়িতেন, রমজান মাসেও ততটুকুই নফল নামাজ পড়িতেন। কিন্তু হাদিস হইতে ইহাও জানা যায় যে রমজান মাসে তিনি অন্যান্য দিনের তুলনায় নামাজে অধিক সময় লাগাইতেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ রাকাতসমূহ পড়িতেন এবং অনেক সময় উহাতে তিনি রাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তদুপরি তিনি এই এবাদত অতি যত্নসহকারে নিয়মিত পালন করিতেন। এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়া সুরা জুমারে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ঃ

امن هو قانت اناء الليل ساجدا او قائما يحذر الاخرة و يرجو رحمة ربه - قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون - انما يتذكر اولوا لا لباب ٥ (ع ١)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদা এবং কেয়ামের মাধ্যমে ফরমাবরদারীর নমুনা প্রদর্শন করে এবং আখেরাতকে ভয় করে, আবার তাহার রবের রহমতের প্রতিও আশা রাখে, সে কি নাফরমান ও অবাধ্যের ন্যায় হইতে পারে? তুমি বলিয়া দাও যে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এবং অজ্ঞগণ উভয় কি সমান হইতে পারে?! উপদেশ তো কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই গ্রহণ করিয়া থাকে।"

এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে শুভ-সংবাদ দিয়াছেন যে তাঁহার দৃষ্টিতে সেই সকল লোক, যাহারা রাত্রিকালে সেজদা এবং কেয়ামের মাধ্যমে আজেযী ও বিনয় সহকারে তাহাদের এতায়াত ও আনুগত্য খোদাতায়ালার সমীপে পেশ করে, তাহারা তাঁহার দৃষ্টিতে সুমহান মর্যাদা রাখে। আল্লাহতায়ালা এখানে মুমেনের এবাদত গৃহীত বা কবুল হওয়ার পূর্বেকার অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে মুমেন দিনের বেলায়ও এবাদত করে ও রোজা রাখে এবং রাত্রিকালের এবাদতও করে, ইহা সত্বেও يحذر الاخرة সে এ বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে তাহার শুভপরিণাম হইবে কি না। খোদাতায়ালা তাহার এবাদত কবুল করিবেন কি না। কেননা কতক গোপনীয় গোনাহ্ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এরূপ আছে,

যেগুলি তাহার আমলসমূহকে এমনভাবে বিকৃত করিয়া দেয় যে, সেগুলি খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য থাকে না। আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে, প্রকৃত মুমেন দিনের বেলায়ও এবাদত করে এবং রাত্রিতেও কেয়াম এবং সেজদা করে এবং নির্জনে ও নিরবে খোদাতায়ালার সমীপে বিনয়াবনত হইয়া তাঁহার নিকট এতায়াত ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। কিন্তু এত এবাদত পালন করা সত্ত্বেও সে এই সকল আমলের উপর ফখর বা গর্ববোধ করে না এবং তাহার প্রতীতি হয় না যে, খোদাতায়ালা তাহার এই আমলগুলিকে নিশ্চয়ই কবুল করিবেন। 'আখেরাত'-এর অর্থ—'পরে যাহা আসিবে'—হইয়া থাকে, এবং কোন নেক আমলের পরবর্তীতে যাহা আসে তাহা হইল উহার কবুল হওয়া এবং শুভ ও কল্যাণময় পরিণাম ঘটা। يحذر الاخرة মুমেন নেক আমল সম্পাদনের পরও ভয় করিতে থাকে যে, খোদাতায়ালা তাহা কবুল করেন কি না, উহাতে এরূপ দোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তো থাকিয়া যায় নাই, যেগুলির কারণে উহা খোদাতায়ালার দরবার হইতে রদ হইয়া যায়। তারপর মুমেন উক্ত ভীতি সত্ত্বেও এই আশাও পোষণ করে যে, রহীম—করুনাময় খোদা তাহার দুর্বলতাসমূহ উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি আপন ফজল ও এহ্সান প্রদর্শন করিবেন, তাহার মাগফিরাত করিবেন এবং তাহার দুর্বলতাসমূহ ঢাকিয়া দিবেন। মাগফিরাত ও এহ্সান উভয়ের অর্থ 'রহমতে' অন্তর্নিহিত বা বিদ্যমান থাকে। অতএব আল্লাহ্তায়ালা বলেন ঃ

يرجو رحمة ربه

মুমেন বান্দা আশা রাখে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার দুর্বলতাসমূহ মাগফিরাতের চাঁদর দ্বারা ঢাকিয়া দিবেন এবং একমাত্র স্বীয় ফজল ও অনুগ্রহক্রমে তাহার এবাদতকে কবুল করিবেন। আল্লাহ্ বলেন যে, সেই সকল বান্দা, যাহারা দিবা-রাত্রি আল্লাহ্তায়ালার এবাদত করে, তারপর ভীত থাকে যে, তাহাদের আমল কবুল হয় কি না, তেমনি তাহারা আমার রহমতের উপর ভরসা করিয়া আশা রাখে যে, আমি আমার ফজল ও অনুগ্রহক্রমে তাহাদের আমল সমূহ কবুল করিব—সেই সকল বান্দাকে শুভ-সংবাদ দিতেছি যে আমি আমার ফজল ও অনুগ্রহক্রমে তাহাদের আমলসমূহ কবুল করিব—সেই সকল বান্দাকে শুভসংবাদ দিতেছি যে, আমি তাহাদের আমলসমূহকে তাহাদের জন্য ঈদ-স্বরূপ করিয়া দিব এবং তাহাদের সহিত আমার ব্যবহার সেই সকল লোকের চেয়ে ভিন্নতর হইবে যাহারা উদ্ধত ও অহংকারী। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, হে রসুল! তুমি আমার পক্ষ হইতে ঘোষণা করিয়া দাও যে,

هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون -

সেই সকল লোক, যাহারা এই সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে যে, তাহাদের আমলসমূহ সেই যাবতীয় গুণে গুণান্বিত নয়, যেগুলির ফলশ্রুতিতে তাহারা নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে, বরং তাহাদের জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ্-তায়ালার ফজল এবং তাঁহার রহমতেরই প্রয়োজন, ইহারা সেই সকল লোকের সমতুল্য নয় যাহারা এই প্রকৃত সত্য ও মৌলিক তত্বটি বুঝে না। তাহারা অল্পকিছু আমল সম্পাদনের পরই দম্ভ ও অহংকারে লিপ্ত হইয়া পড়ে এই ভাবিয়া যে, তাহারা অনেক নেকী করিয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে নিশ্চয় জান্নাত দান করিবেন। কেননা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই গ্রহণযোগ্য বা গৃহীত হয়, যে নেক আমলসমূহ পালন করার পরও এজন্য ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে যে, তাহার নেক আমলসমূহ যেন খোদাতায়ালার দরবার হইতে রদ না হয়। ইহার সঙ্গেই সে এই আশাও পোষণ করে যে, খোদাতায়ালা অত্যন্ত রহীম (দয়ালু), তিনি তাহার আমলকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না, তিনি তাহার ত্রুটি ও দুর্বলতাসমূহ দূর করিয়া দিবেন এবং একমাত্র স্বীয় ফজল ও অনুগ্রহের দ্বারা তাহাকে স্বীয় নৈকট্য ও সন্তুষ্টির মোকামে উপনীত করিবেন।

সুতরাং এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, প্রতিটি বিষয় যাহা আমলে সালেহ (সৎকর্ম) এর সহিত সম্পৃক্ত, উহা কেবল খোদতায়ালার ফজল ও করমেই হাসিল হইয়া থাকে। সেইজন্য কোন পর্যায়েই মানুষের ইহা বুঝা উচিত নয় যে, তাহার মধ্যে এমন কোন গুণ ছিল যে জন্য সে এরূপ নেক আমল করিয়াছে। যেমন কোন সময় যখন মানুষের অন্তরে কোন নেক আমলের প্রতি আগ্রহ জন্মায় তখন তাহার ইহা মনে করা উচিত নয় যে তাহার মধ্যে কোন সাক্ষাৎ গুণ বা নেকী ছিল যাহার জন্য তাহার হৃদয়ে এই নেক আগ্রহ ও আকাঙ্খা সৃষ্টি হইয়াছে। অতঃপর যখন সে আকাঙ্খাকে কার্যকরী রূপদান করার জন্য নিয়ত বা সংকল্প গ্রহণ করে, তখনও তাহার এই ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহার মধ্যে কোন সাক্ষাৎ গুণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার কারণে সে এই নেক আকাঙ্খাকে কার্যে রূপায়িত করার নিয়ত বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছে, বরং সে যেন মনে করে যে, ইহাও আল্লাহতায়ালার ফজল যে, তাহার আকাঙ্খা নিয়ত বা সংকল্পে পরিবর্তিত হইয়াছে। আবার যখন সেই নিয়ত আমলে রূপায়িত হয় তখনও সে যেন মনে করে যে ইহা কেবল আল্লাহ্তায়ালারই ফজল যে, সে তাহার নিয়ত অনুযায়ী সেই নেক আমল করার তওফিক বা সমর্থ লাভ করিয়াছে। অতঃপর যখন সেই আমল কবুল হইয়া যায়, তখনও সে যেন মনে করে যে, তাহার মধ্যে তো কোনই খুবী ছিল ন, তাহার আমলের মধ্যে হাজারো ত্রুটি ছিল, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা বড়ই এহ্সানকারী, তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহকারী, বড়ই ক্ষমাশীল ও মাগফিরাতকারী, তিনি তাঁহার গাফ্ফার হওয়ার গুণের ফলশ্রুতিতে এবং তাঁহার রহীম হওয়ার গুণের ফলশ্রুতি হিসাবে তাহার ত্রুটীযুক্ত আমলসমূহকে কবুল করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মোট কথা, প্রতিটি নেক আমলের মধ্যে কমপক্ষে চারটি ঈদ বিদ্যমান রহিয়াছে, কেননা মানুষ উহাদের ফলশ্রুতিতে নিজের উপর চারিবার খোদাতায়ালার ফজল বর্ষিত হইতে দেখে। আল্লাহতায়ালা পবিত্র রমজান মাসে আমাদের জামাতকে তওফিক দিয়াছেন যে, তাহারা পূর্বের চাইতে অধিক এবাদতের দিকে মনোযোগী হইতে পারিয়াছেন। সুতরাং কয়েক বৎসর পূর্বে দরসে যোগদানকারী এবং নামাজ তারাবীতে অংশ গ্রহণকারীদের সম্বন্ধে যে সকল রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে সেগুলির তুলনায় এই বৎসরে ছয়—সাত গুণ বেশী লোক কুরআন করীমের দরস এবং নামাজ তারাবীতে শামিল হইয়াছেন। যখন আমি দেখি যে,

আল্লাহতায়ালা এ বৎসর জামাতের ব্যক্তিবর্গকে তওফিক দিয়াছেন যে, তাঁহারা বিপুল সংখ্যায় কুরআনী উলুম ও তত্ব সমূহ শিক্ষালাভ করার এবং রাত্রিকালের নামাজ বন্দেগীর দিকে মনোযোগী হইতে পারিয়াছেন, তখন আমার মন বলিয়াছে, ইহাও খোদাতায়ালার ফজল ব্যতিরেকে সম্ভবপর ছিল না এবং যেখানেই আল্লাহতায়ালা ফজল নাযেল হয় সেখানেই মুমেন বান্দার জন্য ঈদের মোকাম হইয়া থাকে।

এবাদতের এই দৃশ্য দেখিয়া আমার অন্তর খোদাতায়ালার হামদ ও প্রশংসায় ভরিয়া যায় এবং আমি প্রাণবন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করি যে, আল্লাহতায়ালা জামাতের উপর ফজল করিয়াছেন এবং জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে তওফিক দিয়াছেন যেন তাহারা এদিকে পূর্বের চাইতে অধিক মনোযোগী হইতে পারেন এবং রাতদিন তাঁহার এবাদতে মশগুল থাকেন। আমার অন্তরের অন্তস্থল হইতে এই দোওয়া আসিয়াছে যে, হে খোদা! তুমি জামাতের লোকদিগকে যেখানে এই তওফিক দান করিয়াছ যে তাহারা বাহ্যিকরূপে নেক ও সৎকর্ম পালনকারী হইতে পারিয়াছেন সেখানে এই ফজল ও অনুগ্রহও কর যে তাহাদের এই সকল আমলকে তুমি গ্রহণ কর, যাহাতে তাহারা চতুর্থ তথা চূড়ান্ত ও প্রকৃত ঈদেরও অধিকারী হইতে পারে। (আল্লাহুম্মা আমীন)।

খোৎবা সানীয়ার পর হুজুর (আইঃ) বলেন: এখন বন্ধুগণ দোওয়া করুন— আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের এবাদতকে কবুল করেন এবং যেভাবে আমাদের আমল সমূহ দৃশ্যতঃ আমাদের নিকটও এবং দুনিয়ার নিকটও নেক বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তেমনিভাবে উহাদের পরিণামকেও নেক ও শুভ করেন এবং এরূপ করেন যেন আমাদের প্রতিটি আমলের চারটি ঈদ আমাদের নসীবে ঘটে এবং প্রতিটি দিন যে উদিত হয় তাহা যেন তাঁহারই ফজলও অনুগ্রহ ক্রমে আমাদের জন্য ঈদের দিন হয়, এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঈদ যাহার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, অর্থাৎ—ইসলামকে বাকী সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের উপর জয়যুক্ত ও প্রাধান্য দান করা—তাহা যেন আমাদের জীবদ্দশাতেই যথাশীঘ্র দেখান যাহাতে আমরা যেন সেই আনন্দকে লাভ করিতে পারি, যাহার জন্য উম্মতে মুসলেমা শত শত বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। (আল-ফজল, ১৬ই মার্চ ১৯৬৬ইং)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

"আল্লাহর রজ্জুকে জামাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"— আল-কোরআন

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪৮)

পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে :

(৩) পবিত্র কুরআনের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনাটিকে হযরত মীর্যা সাহেব এমন একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার ফলে এই পবিত্র গ্রন্থের অনুপম শিক্ষা ও সৌন্দর্য অপ্রতিহত রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। সাধারণভাবে মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, পবিত্র কুরআনের আবেদন এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে তুলনায় শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু কেন শ্রেষ্ঠতম? কোন ধর্ম-গ্রন্থের অনুসারীর কাছে সেই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকতে হবে—অন্যথায় শুধু মৌখিক দাবীর কোন মূল্য নাই। এ কথা বলা ঠিক নয় যে, "তোমার ধর্মগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠতম মনে করার অধিকার তোমার রয়েছে এবং আমারও অধিকার রয়েছে আমার ধর্মগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠতম ভাববার।" এই ধরণের মত-পার্থক্যের মীমাংসার জন্য কিছু না কিছু যুক্তি-বিচারের মাপকাঠি এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতি থাকা একান্ত আবশ্যক। হযরত মীর্যা সাহেব পবিত্র কুরআনের মধ্যেই নিহিত যুক্তি বিচারের মাপকাঠির উল্লেখ করেছেন এবং তিনি সেই সকল বিচার ও বিশ্লেষণ প্রসূত মানদণ্ড পুনঃপুনঃ ব্যবহার করেছেন। এইভাবে পবিত্র কুরআনের অধ্যয়ন ও অর্থোপলব্ধির জন্য এবং উহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন।

(৪) হযরত মীর্যা সাহেব আরো বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী একাধিক অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে। মানব জাতির জন্য ঐশীবাণীর একটি স্থায়ী এবং সর্বকালীন আধাররূপে প্রেরিত এই মহাগ্রন্থের অর্থের ব্যাপকতা থাকাটাই স্বাভাবিক। শুধু বিভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানুষের উপকারের এবং উপভোগের জন্যই নয়, সেইসঙ্গে এই মহাগ্রন্থের একই শব্দ বা আয়াত মানুষের বিভিন্ন অবস্থা এবং প্রয়োজনের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজ্য হতে পারে। এর মূলে রয়েছে কুরআনের প্রাসঙ্গিক শব্দাবলীর আশ্চর্যজনকভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের যোগ্যতা।

(৫) হযরত মীর্যা সাহেব এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে ততখানি জ্ঞান দান করে যতখানি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং যথোপযুক্ত।

(৬) পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন কালে কতকগুলো বিষয়ের ব্যাখ্যা করা কঠিন বলে মনে হতে পারে। এরূপ ব্যাখ্যা-জনিত অসুবিধা সম্বন্ধে হযরত মীর্যা সাহেব এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, এই পবিত্র গ্রন্থে দুই প্রকারের এবারত বা ভাষ্য রয়েছে—(১) 'মুহকাম' বা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত

ভাষ্য এবং (২) 'মুতাশাবিহ' বা প্রবাহমান অর্থবিশিষ্ট ভাষ্য। সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শেষোক্ত অর্থাৎ 'মুতাশাবীহ' বিষয়গুলোকে প্রথমোক্ত 'মুহকাম' বিষয়াবলীর আওতাধীনে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই ধরণের আরো কতকগুলো নীতি তিনি প্রণয়ন করেন যেগুলোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা-জনিত ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা সহজতর হয়েছে।

(৭) হযরত মীর্যা সাহেব পবিত্র কুরআনের আলোকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের ইসলামী স্তর সমূহ কি কি তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই বর্ণনা সত্যিকারভাবে ইসলামী জীবন-যাপনে আগ্রহী মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৮) আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আমরা হযরত মীর্যা সাহেবের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী, আয়াতসমূহ এবং সুরা বা অধ্যায়গুলোর বর্ণনা-বিন্যাসের অন্তর্নিহিত যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বাবলী সম্পর্কিত তাঁর আবিষ্কারসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন পাশ্চাত্যের লেখকগণ এসম্বন্ধে অদ্ভুত এবং অমূলক প্রতিচ্ছবি তৈরী করে রেখেছিলেন। তাদের মতে পবিত্র কুরআনে কোন যুক্তিসিদ্ধ শব্দ-বিন্যাস নাই, বিষয়-বস্তুগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য এবং সুবিন্যস্ত পারম্পর্য নাই। পাশ্চাত্যের লেখকদের এই ধরণের সমালোচনাকে মুসলিম লেখকগণও নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। মনে হয় সবই ভুল বসেছিল যে, সাধারণ বহি-পুস্তকে বিষয়-বস্তুর বর্ণনা ধারা বা বিন্যাস শুধু বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে; কিন্তু পবিত্র কুরআনে অনুসৃত বর্ণনা-ধারার তাৎপর্য গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিষয়-বস্তু পরিব্যপ্ত। আর সেই গভীরতম তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্যকভাবে জানতে হলে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। এরূপ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে কাছাকাছি সন্নিবেশিত ভাষ্যগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক এবং দূরবর্তী ভাষ্যসমূহের সঙ্গে বিরাজমান অর্থপূর্ণ যোগসূত্র—উভয় বিষয় সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা-বিন্যাসের যথার্থতা উপলব্ধি করা সম্ভব। এই ধরণের বর্ণনা-বিন্যাসের যোগসূত্র সত্যসত্যই আশ্চর্যজনক। এই আশ্চর্যজনক উপলব্ধি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন দেখা যায় যে, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা-ধারা সুবিন্যস্তভাবে সামগ্রিকভাবে অর্থপূর্ণই থেকে যায়—এমনকি যখন আমরা কোন একটি বিষয়কে একটি বিশেষ দিক থেকে ব্যাখ্যা করি এবং যখন একই বিষয়কে অন্য আর একটি দৃষ্টি-কোন থেকে আলোচনা করে থাকি।

(৯) আরও একটি বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কিত হযরত মীর্যা সাহেবের আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত এবং ভাষ্যের সমন্বয়ে যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথোপযুক্ত 'মজমুন' বা রচনা তৈরী করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ভাল' অথবা 'মন্দ' সম্পর্কিত আলোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উভয় বিষয়ের বিভিন্ন স্তর সমূহ, উহাদের ফলশ্রুতি এবং প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয় অর্থাৎ নৈতিক উন্নতি সম্পর্কিত পুরাপুরি বিষয়টিকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পেশ করা যায়। এই ধরণের বর্ণনা আমাদের জন্য আলোক-বর্তিকা হিসাবে পথ-নির্দেশক হতে পারে, আমাদেক নানা প্রকার অধঃপতন হতে রক্ষা করতে পারে এবং সকল অলীক লক্ষ্যস্থল হতে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে।

(১০) সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির জন্য আমরা হযরত মীর্যা সাহেবের নিকট ঋনী তা হলো পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক অধ্যায় 'সুরা ফাতিহা' সম্পর্কিত তাঁর মহা-আবিষ্কার। এই সুরাটি সমগ্র কুরআন করীমের সংক্ষিপ্ত-সার বিশেষ। সুরা ফাতিহায় বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনের সারকথা—বিশ্বাস বা কাজকর্ম সম্পর্কিত যে সকল বিষয় সমগ্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তারই নির্যাসিত সারমর্ম। হযরত মীর্যা সাহেব এই সুরার উপরে অনেক 'তফসির' লিখেছেন এবং এই সুরার আলোকে বহু বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলা যায় যে, যে-কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য তিনি সর্ব প্রথম পবিত্র কুরআনের এই সুরার সাতটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এই সকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে—আল্লাহ এবং তাঁর গুণাবলী, অথবা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, বিশেষতঃ মানুষের সংগে স্রষ্টার সম্পর্ক, অথবা মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(১১) পরিশেষে আর একটি আবিষ্কার সমন্ধে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে হলে এবং উহার অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বাবলী সম্বন্ধে সম্যকভাবে জানতে হলে শুধু পার্থির জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বরং তজ্জন্য আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ বা 'ফজল' লাভ করতে হবে এবং এই বিশেষ অনুগ্রহের মাধ্যমে সত্যিকার কুরআনী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভব। তাই আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: "মানুষ আল্লাহতায়ালার জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করতে পারে না—শুধু সেই পরিমাণ জ্ঞান ব্যতীত যাহা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে দান করেন।" (আল বাকারা : ২৫৬)।

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, পবিত্র কুরআনের সত্যিকার জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। চারিত্রিক পবিত্রতাই এরূপ জ্ঞানার্জনের প্রধান শর্ত। আল্লাহতায়ালা সেজন্যই ঘোষণা করেছেন:

لا يمسه الا المطهرون

অর্থ: "শুধু পবিত্রচেতা ব্যক্তিরাই কুরআনের সত্যিকার অর্থ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।" (সুরা ওয়াকিয়া : ৮০)

এই কারণেই এবং স্বাভাবিকভাবেই হযরত মীর্যা সাহেব তাঁর অমান্যকারীদের প্রতি প্রশ্ন রেখেছেন: "আমি যদি মিথ্যাদাবীকারক হয়ে থাকি তাহলে পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের জ্ঞান আমি কোথেকে লাভ করেছি?"

সমসাময়িক কালের পণ্ডিত ব্যক্তি এবং চিন্তাবিদদেরকে তিনি তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন—পবিত্র কুরআনের অর্থোপলব্ধি এবং অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য। পবিত্র কুরআনের যে-কোন অংশ নির্বাচন করে তাঁর সঙ্গে তফসির করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এর ফলে প্রমাণিত হবে যে, পবিত্র কুরআনের অর্থোপলব্ধি ও ব্যখ্যার ক্ষেত্রে কে বেশী ঐশী সাহায্য এবং অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ। তাঁর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য কোন ব্যক্তি সাহস পায় নাই।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রশংসামূলক রচনাবলী সম্বন্ধে মুসলিম পণ্ডিত এবং সাধু ব্যাক্তিগণ অনেক প্রতিযোগিতাই করেছেন। হযরত মীর্যা সাহেবও 'স্তুতিবাদ' লিখেছেন—শুধু হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধেই নয়, পবিত্র কুরআন সম্পর্কেও। এই বিষয়ে তাঁর লেখা আরবী ও ফার্সী কবিতাগুচ্ছ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। (ক্রমশঃ)

'দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

মাহদীর সেনাদল

আল্লাহর দুনিয়ায় ডরিব কাহারে, মোরা মাহ্দীর সেনাদল,
সত্যের ঝাণ্ডা আকাশে উড়ায়ে, ওরে দিকে দিকে তোরা চল।
পিছন তাকাবার নাহি অবসর কুফরীর বুকে পদ ফেলি,
ভেদ করি চল দুর্বার গিরি বাধা সংকট শত দলি।
দিতে হবে কুরবানী জোর ক্লান্তি শ্রান্তি নহে এই ক্ষণে,
সত্যের জয় হবে নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা পাক কুরআনে।
ঈমানের তেজে দ্রুত পদে চল দুর্জয় পথ করি জয়,
পূত বিভু প্রেম অন্তরে যার দুষমনে তার কিসের ভয়।
কামান বন্দুকের লড়াই এ নহে, এ যে ঈমানের পরীক্ষা ভাই,
আল্লাহর মাহদী ডেকে কহে চল সময় আর বেশী নাই।
জাহান্নাম সম জ্বলিছে বিশ্ব দাজ্জালরূপী ইবলিস ছদ্মবেশে,
ঈমান আমল হরে নিয়ে ভুমে নাচে আজি উল্লাসে।
ভুবন জুড়ে এক পরিবার ভাই ভাই যারা এক প্রা',
হরেক রকম ছল কলায় বেঁধে ভেঙ্গে করে খান খান।
লোভ হিংসা, দ্বেশ দ্বন্ধ, হের স্বার্থের হানাহানি,
দ্বীনের প্রদ্বীপ নিবু নিবু জ্বলে কে শুনায় সাম্যের বাণী।
হেন কালে এসে ইমাম মাহদী ডেকে কহিলেন ভাই,
শান্তির ছায়াতলে দলাদলি ভুলে হইবারে এক ঠাঁই।
খেলাফত পুণঃ গড়িলেন আল্লাহর আহমদী জামাত নাম,
মিথ্যার কালিম মুছে ফেলে দিয়ে শান্তি সুখে ভরেদিতে ধরাধাম।
অগ্রে চল তুমি হে বীর সেনাদল! হাতে নিয়ে ঈমানের তেজ,
দ্বীনের শত্রু দাজ্জাল নাশিতে চল আজ দ্রুত বেগ।
বুকে নিয়ে চল জেহাদী জোশ আল্লাহর পথে প্রাণপণ
পিছন হটিছে দুশমন হের ভঙ্গ দিয়ে তার রণ।
বাধা বিপদ শত দু'পায়ে দলি দিকেদিকে চল আজ ভাই,
রাজার মুকুট লুটাবে পদে, সেদিন বেশী আর দূরে নাই।

—সরফরাজ আব্দুস সাত্তার

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অষ্টম বার্ষিক ইজতেমা

৭, ৮, ও ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৭ ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ইং, মোতাবেক ২১, ২২, ও ২৩শে ভাদ্র, ১৩৮৬ বাংলা রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার তিন দিন ব্যাপী বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৮ম বার্ষিক ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ। প্রথম অধিবেশন শুক্রবার বাদ জুম্মা অনুষ্ঠিত হইবে।

সকল মজলিস হইতে যেন বেশী বেশী খোদ্দাম ও আতফাল এই মহতী ইজতেমায় যোগদান করিয়া ফায়েদা হাসিল করিতে পারেন সেই জন্য পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করিতেছি। যেখানে কোন মজলিস নাই কিন্তু খোদ্দাম বা আতফাল আছেন সেখান থেকে যেন তাহারা ইজতেমায় যোগদান করেন তার জন্য সেখানকার অবিভাবকদের নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

ইজতেমার সর্বাঙ্গীন কমিয়াবীর জন্য খাস দোয়ার আবেদন জানাইতেছি। খাকসার—

মোতামেদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানান যাইতেছে যে ক্রোড়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত বাসুদেব গ্রাম নিবাসী ডাঃ ফজলুর রহমান ভুইয়া সাহেব ৮ই আগষ্ট ১৯৭৯ বুধবার সকাল ১০ টার সময়ে এন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৭৫ বৎসর। তিনি জ্বর, কাশি ইত্যাদি রোগে কিছুকাল হইতেই উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে দুর্বল হইয়া পড়েন যার ফলে জ্বরেই মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ৫ ছেলে ও ৮ মেয়ে এবং দুই বিবি রাখিয়া যান। মরহুমের রুহের মাগফিরাত এবং দারাজাত বুলন্দির জন্য বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন। আমরা শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও অন্যান্য সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করিয়া সমবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।

দোয়ার আবেদন

জনাব গোলাম মওলা খাদেম সাহেব, (প্রেসিডেন্ট খড়মপুর জামাত) কিছুকাল হইতে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন এবং জ্বর প্রবল হইলে প্রায় ৫/৬ ঘন্টার জন্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তিনি বর্তমানে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। তাহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করিবেন। তাহার স্ত্রীও অসুস্থ। তাহার জন্যও দোয়া করিবেন।

আখবারে আহমদীয়া

দৈনিক আল-ফজলে প্রকাশ যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্। হুজুরের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং বিশ্বব্যাপী গালাবারে-ইসলামের উদ্দেশ্যে যাবতীয় জামাতী চেষ্টার সাফলের জন্য নিয়মিত দোওয়া জারী রাখিবেন।

০ ০ ০

মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া আল্লাহতায়ালার ফজলে এখন সাধারণরূপে সুস্থ আছেন। সম্পূর্ণভাবে তাঁহার দুর্বলতা কাটিয়া উঠার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার অনুরোধ জানান যাইতেছে।

০ ০ ০

ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের চত্বর মোজাইক করার কাজ চলিতেছে। গেষ্ট হাউস ও মসজিদের কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন।

০ ০ ০

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাসে স্থানীয় সদর মুরুব্বী মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব ও মুয়াল্লেম মৌঃ শামশুজ্জামান সাহেবের পরিচালনাধীনে আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রায় ১৫ জন খোদ্দাম ও ২০ জন আতফালকে দ্বীনি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদে দৈনিক ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়।

০ ০ ০

নারায়ণগঞ্জ জামাত এবং মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাসে স্থানীয় মসজিদে ১৫ দিন ব্যাপী একটি দ্বীনি শিক্ষার ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত উহা পরিচালনা করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মুন্সী আব্দুল খালেক সাহেব। সহযোগিতা করেন স্থানীয় জামাতের জেঃ সেক্রেটারী জনাব শ, ইসলাম এবং অন্যান্যগণ। পরিশেষে যোগদানকারী খোদ্দাম ও আতফালের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীদিগকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন নায়েব আমীর জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী।

০ ০ ০

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে একটি হোমিও প্যাথী দাতব্য চিকিৎসালয় ২০শে জুলাই ৭৯ইং হইতে আল্লাহতায়ালার ফজলে সাফল্যের সহিত চলিতেছে। প্রতি রবিবার সকাল আটটা হইতে একটা পর্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণী নির্বিশেষে রুগীগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। পরিচালনা করেন ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব। সহকারী হিসাবে আছেন মুয়াল্লেম মৌঃ শামশুজ্জামান সাহেব।

উল্লেখযোগ্য, বহু পূর্ব হইতে ৪নং বক্সী বাজার রোড ঢাকা দারুত তবলীগে স্থাপিত জামাতের দাতব্য চিকিৎসালয়টির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার ফজলে জনসেবার কাজ সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে।

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" গ্রন্থে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar